দৈনন্দিন সালিশ ও আইন

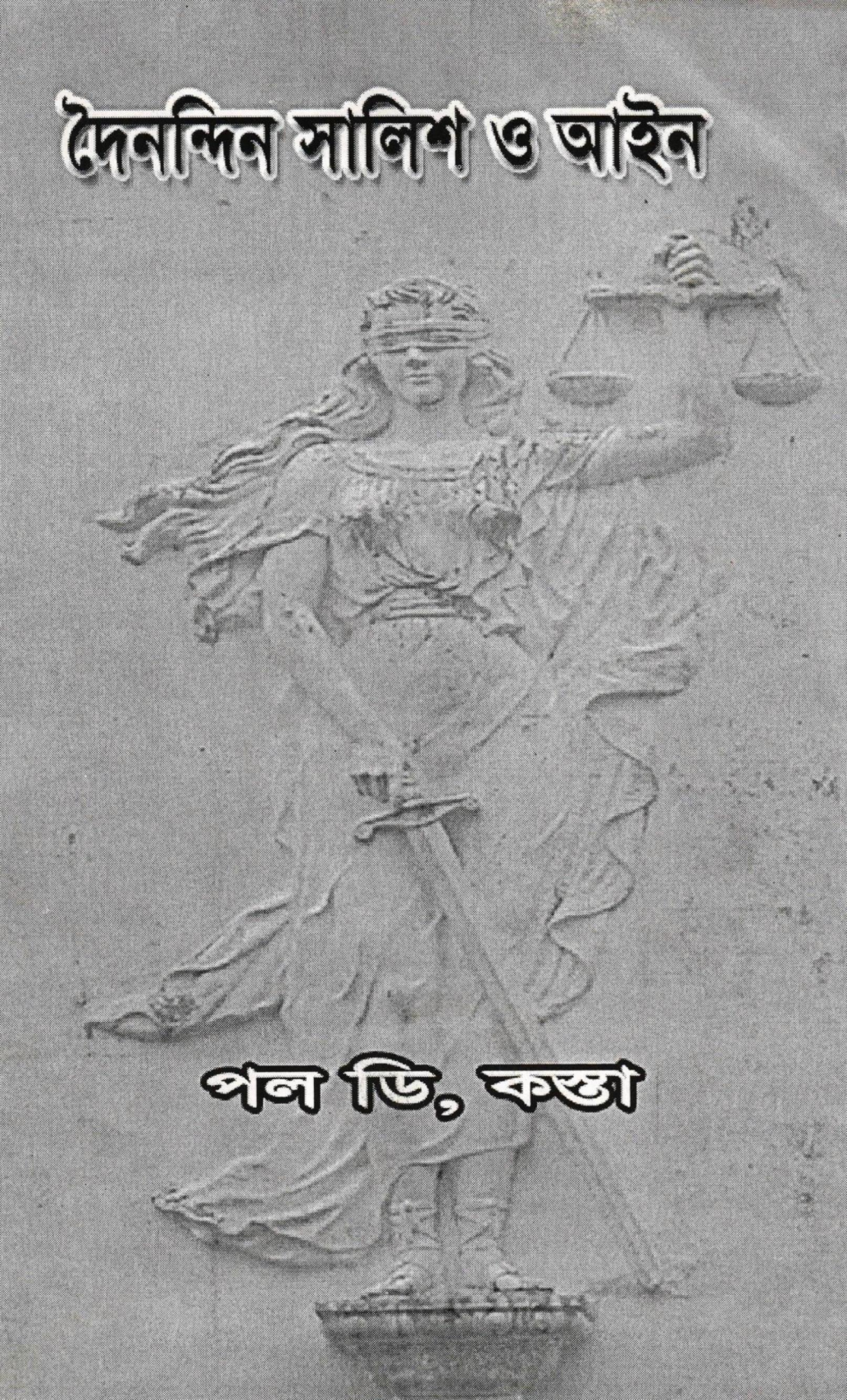

পল ডি, কস্তা

দৈনন্দিন সালিশ ও আইন

পল ডি, কস্তা

রূপান্তর

www.pathagar.com

দৈনন্দিন সালিশ ও আইন

পল ডি, কস্তা

Dainondin Salish o Ain

Paul D' Costa

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০০৪

প্রকাশক

রূপান্তর

১৪/১, ফারাজীপাড়া লেন,

খুলনা-৯১০০, বাংলাদেশ।

ফোন: ০৪১-৭৩১৮৭৬

ফ্যাক্স : ০৪১-৮১০৭৪৭

ই-মেইল : rup@khulna.bangla.net

rupantar@bttb.net.bd

মুদ্রণে

শিল্পরূপ

ফারাজীপাড়া, খুলনা।

ISBN 984-629-006-3

USAID-এর অর্থায়নে পরিচালিত স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের আওতায় পুস্তিকাটি প্রকাশিত

www.pathagar.com

পুস্তিকা প্রসঙ্গে

রূপান্তর ১৯৯৫ সালে সুন্দরবন অঞ্চলে তার কর্মকান্ড শুরু করেছিল সাধারণ মানুষকে সচেতন করার মানসে। নাটক, পটগান, সুলভ প্রকাশনা দিয়ে কর্মকান্ড শুরু হলেও এখন তার সাথে যোগ হয়েছে আরো অনেক কিছু। রূপান্তরের এ সকল কর্মকান্ড সফল হচ্ছে মূলত এ অঞ্চলের অধিকার অর্জনে পিছিয়ে থাকা নারী-পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ।

রূপান্তর তার সুলভ প্রকাশনার মাধ্যমে কর্মএলাকার সাধারণ পাঠকদের পাঠক্ষুধা নিবৃত করার জন্য বরাবরের মত এবারও প্রকাশ করলো 'দৈনন্দিন সালিশ ও আইন' নামক পুস্তিকাটি। দৈনন্দিন আইন নামে একটি পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম ১৯৯৯ সালে। ঐ পুস্তিকার পাঠকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়ে এই পুস্তিকাটি প্রকাশে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আশা করছি, আবারও পাঠকদের সালিশ ও আইন বিষয়ক জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। পুস্তিকাটি যথাযথভাবে প্রণয়নে আমাদের বন্ধু এ্যাডভোকেট পল ডি, কস্তা অনেক শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন। রূপান্তরের পক্ষে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (USAID) সবসময় রূপান্তরের সুশাসন বিষয়ক কর্মকান্ডে সহায়তা করে থাকে। এই পুস্তিকাটি প্রকাশে আমরা তাদের কাছ থেকে শর্তহীন সহায়তা পেয়েছি। এ পুস্তিকার পাঠকদের পক্ষে USAID-কে আগাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রূপান্তরের সুলভ প্রকাশনার সমৃদ্ধির জন্য এ যাবৎকাল সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছেন এ অঞ্চলের সুধী পাঠকবৃন্দ। আশা করছি, এই পুস্তিকার পাঠকরা বিগত সময়ের মত মূল্যবান পরামর্শ রেখে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন।

স্বপন গুহ
প্রধান নির্বাহী
রূপান্তর

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০৪ ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সাধারণ আইন প্রসঙ্গে ধারণা - ০৫
ফৌজদারী আইন ও তার প্রয়োজনীয়তা - ০৭
দেওয়ানী আইন ও আদালতের শ্রেণী বিভাগ - ০৮
দৈনন্দিন জীবনে জরুরী আইনসমূহ - ০৯
সামাজিক বিরোধ ও তার ফলাফল - ১৮
পুলিশ এবং তার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব - ২৪
সালিসী ধারণা - ২৭

www.pathagar.com

সাধারণ আইন প্রসঙ্গে ধারণা

আইন কাকে বলে :

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে মানুষ একে অন্যের প্রয়োজন মিটিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বা অশান্তি দেখা দেয়। কোন মানুষেরই কিন্তু এই অশান্তি কাম্য নয়। সে চায় সুখে শান্তিতে বসবাস করতে। এই বিবাদ কিসের ভিত্তিতে/মানদন্ডে মীমাংসা করা যায়? মানব ইতিহাসে দেখা যায় মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে সুখে শান্তিতে বসবাসের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সহজ কথায় বলা যায়, যে মানদন্ডের দ্বারা এই বিবাদসমূহের হাত থেকে মানুষকে শৃঙ্খলার পথে আনা যায় তাকে আইন বলে। এক কথায় মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও প্রয়োগকৃত বিধিই আইন। আইন হল সার্বভৌম শক্তির আদেশ। স্যালমন্ডের ভাষায় আইন হল : 'রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগকৃত নীতিসমূহ যাহা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে।' এই আইন মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করে সমাজে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে সহায়তা করে। মোট কথা, মানুষের বিবেক সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও প্রেমের পথে চলতে যে শিক্ষা দেয় তা-ই আইন। ন্যায় বিচার বা ন্যায্যতার ধারণা থেকে আইনের ধারণা উৎসারিত বা বৈধতা লাভ করেছে। আইনের প্রথম ও শেষ কথা হলো ন্যায় বিচার বা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা। সাধারণ ব্যক্তির অধিকার থেকে আইন উদ্বুদ্ধ হয়। এই অধিকার প্রধানত দুই প্রকার:

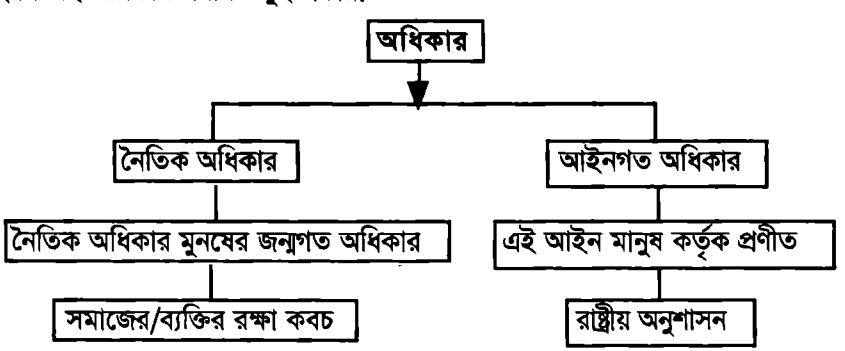

আইন জানা কেন প্রয়োজন :

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ঘটনা আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই আইন হতে পারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ফৌজদারী কিংবা দেওয়ানী। এই আইন আমাদের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে দৈনন্দিন আইন সম্বন্ধে না জানার কারণে দেশের নাগরিকবৃন্দ নানা অসুবিধায় পড়ে হয়রানি হয় এবং অনেক সময় আইন না জানার কারণে বিপদের সম্মুখীন হন, চরম শাস্তি পান।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের ৬২% লোক নিরক্ষর। সমাজে নানা কারণে ঝগড়া-বিবাদ হয়। ফলে ধূর্ত লোকেরা সহজেই আইনের ফাঁক-ফোকরের কারণে নিরীহ নিরক্ষর লোকদের সর্বশান্ত করে ছাড়েন। গ্রামে বা দেশের ঝগড়া-বিবাদ কি সালিসীর মাধ্যমে করা যায় না? জনগণ তাদের সমস্যার মীমাংসা ও ন্যায্য বিচার এবং রায় আদায় করতে পারেন না? এই সব কারণে সর্বসাধারণকে আইনের বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। জনসাধারণ যদি দৈনন্দিন আইন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা রাখেন তাহলে তারা ন্যায় বিচার পাবেন এবং সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। তাছাড়া, রাষ্ট্র ধরে নেয় একজন সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন নাগরিক দেশের আইন সম্বন্ধে অবগত। তাই কোন নাগরিক যদি বলে আমি এই আইন সম্বন্ধে অবগত নই তা আইনত গ্রাহ্য হবে না। এছাড়া, একজন নাগরিক যদি আইন সম্বন্ধে অবগত থাকেন তা হলে তাকে কেউ আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে বিপদে ফেলতে পারবে না। সে সঠিক আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারবে। কোর্ট-কাচারীতে বা উকিলের কাছে তাকে যেতে হবে না এবং অযথা হয়রানি ও টাকা পয়সা ব্যয় করতে হবে না। উপরন্তু, সে অন্যকে আইন বিষয়ে সহায়তা দিতে পারবে এবং বিপদ-সংকুল মানবতাকে দুষ্ট লোকের কবল হতে রক্ষা করতে পারবে। আইন জানার ফলে নাগরিক সমাজে তার যে কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে এবং তার রাষ্ট্রীয় অধিকারসমূহ ভোগ করে সমাজের সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। আইন জানার ফলে ব্যক্তির মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ সচেতন হয়ে নিজে যেমন শান্তিতে বসবাস করতে পারে, তেমনি অন্যকেও শান্তিতে বসবাস করতে অনুপ্রাণিত করে।

দৈনন্দিন আইন কাকে বলে :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের প্রাত্যহিক জীবনে চলতে গিয়ে মানুষ নানা বাঁধা বিপত্তির মুখোমুখী হয়। এই বিপত্তি নিয়ে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। তাই তাকে আইনের আশ্রয় নিয়ে সমস্যা, দ্বন্দ্বের মোকাবেলা করতে হয়। যেসব রীতি, নীতি, নিয়ম-কানুন মানুষের প্রতিদিনের পথ চলতে সহায়তা দিয়ে থাকে তাকেই সাধারণত দৈনন্দিন আইন বলা যায়। এই দৈনন্দিন আইন সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা এবং তা জানা প্রতিটি সুস্থ নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দেশের আইনের বিধান এই যে, সে ধরে নেয় তার অধীনে সব নাগরিকই সুস্থ, সবল এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং সে অবশ্যই আইন জানে। সে যদি তার প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে অধিকারের সাথে জড়িত কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেমন: একজন ব্যক্তি প্রথম গ্রাম হতে ঢাকায় তার আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে আসে। সে জানে না যে রাস্তার ট্রাফিক সিগনালে লাল বাতি জ্বললে তাকে অবশ্যই থামতে হবে। সে লাল বাতি জ্বলার সময় রাস্তা পার হতে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ তাকে আটক করে। এই আইনটি ভঙ্গ করার জন্যে সে

www.pathagar.com

বলতে পারে না যে, সে এই আইনটি জানত না এবং তাই সে নিরপরাধ। এখানে সে আইন না জানার কারণে আইন ভঙ্গ করেছে। আইন না জানা সত্ত্বেও সে দোষী। আইন ধরে নেয় প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রীয় আইন সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল।

ফৌজদারী আইন কাকে বলে:

আইন যা করতে বলে তা যদি কেউ না করে এবং যা করতে নিষেধ করেছে কেউ যদি তা করে তাহলে তার সেই কর্ম বা কর্ম বিচ্যুতিকে অপরাধ বলে। আর এই রূপে অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ অপরাধ দমনের জন্যে যে আইন রয়েছে তাকে ফৌজদারী আইন বলে।

ফৌজদারী আইনের প্রয়োজনীয়তা :

ফৌজদারী আইন নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্ষা কবচ। মানুষের সব ধরণের কার্যকলাপ করা বা না করাকে অনুমোদন করা যায় না। মানুষের কতগুলো আচরণ ও কার্যকলাপ যা অন্যের ক্ষতি ও অনিষ্ট করে তা নিষেধ করা হয়েছে। যে আইনের সাহায্যে তা নিষেধ করা হয়েছে তা ফৌজদারী আইন। এই আইনের সাহায্যে মানুষের অনিষ্টকর আচরণ ও কার্যকলাপের জন্যে শাস্তি দেয়া হয়। মোদ্দা কথা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষার জন্যই এই ফৌজদারী আইন। এই সব কারণে সমাজে ফৌজদারী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফৌজদারী আইনে ১ হতে ৫৬৫টি ধারা আছে। এই সব ধারায় দোষী ব্যক্তির শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে।

ফৌজদারী আদালতের প্রকার, গঠন ও শাস্তি ব্যবস্থা :

বাংলাদেশ অপরাধ বিচারার্থে বর্তমানে ৯ প্রকারের ফৌজদারী আদালতের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে, সরকার প্রয়োজন মনে করলে অতিরিক্ত গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এর রদবদল করতে পারেন। ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচার সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশে যে সকল ফৌজদারী আদালতের অস্তিত্ব রয়েছে তা নিম্নরূপ। যথা :

১. সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ ও আপীলেট বিভাগ।

২. দায়রা আদালত

৩. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

৪. অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেট

৫. বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট

৬. বেঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেট

www.pathagar.com

৭. চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটগন

৮. সহকারী দায়রা জজ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং

৯. বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইবুনাল-১৯৮২ সনের সামরিক বিধি (প্রথম সংশোধনী) আদেশ মোতাবেক।

তবে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্ট এবং এই আইনের আওতা বহির্ভুত অন্য কোন প্রচলিত আইনের বলে গঠিত অন্য আদালত ছাড়া বাংলাদেশে অপরাধ বিচারার্থে প্রধানত চার প্রকারের আদালতকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন:

(ক) দায়রা আদালত

(খ) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

(গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং

(ঘ) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।

দেওয়ানী আইন কাকে বলে:

বাংলাদেশের মানুষের সম্পত্তি, ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদির বিষয় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এই সব সমস্যার সমাধানে যে সব আইন সাহায্য করে এবং বিচার করে তাকে দেওয়ানী আইন বলে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়কেও দেওয়ানী আইন সম্পর্ক করে। আমাদের দেশে ১৯০৮ সালে এই আইন কার্যকরী হয়। এই আইনে ১৫৫টি ধারা এবং ৫০টি আদেশ আছে। এই আদেশের অধীনে অনেক বিধি বিধানও আছে।

দেওয়ানী আদালত কত প্রকার:

দেওয়ানী আদালত চার প্রকার। যথা–

১. জেলা জজ আদালত

২. সাব জজ আদালত

৩. সহকারী জজ আদালত

৪. ছোট মামলার আদালত

এছাড়াও সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুভব হলে বিশেষ বিশেষ আদালত গঠন করে থাকে। এইগুলো হল: (ক) পারিবারিক আদালত, (খ) গ্রাম আদালত, (গ) মোটর যান দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ জন্য "দাবী আদায় ট্রাইবুনাল" , (ঘ) অর্থ ঋণ আদালত, ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এফ, আই, আর (F.I.R) কি?

এফ, আই, আর এর অর্থ হল First Information Report। এই এফ, আই, আর, বা এজাহার হল অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক খবর বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী যা থানায় দেয়া হয় এবং যার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। এই প্রাথমিক তথ্য বিবরনী ফৌজদারী আইনের ১৫৪ ধারায় আমলযোগ্য অপরাধ। থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসাারের নিকট এফ, আই, আর, বা এজাহার করতে হয়। এই এফ, আই, আর এর ভিত্তিতে যার বিরুদ্ধে থানায় প্রাথমিক খবর দেয়া হয় তদন্তের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়। আবেদনকারী লিখিত আকারে এফ, আই, আর, এর আবেদন করবেন। এফ, আই, আর, লেখা শেষ হলে তা তথ্য প্রদানকারীকে পড়ে শুনাতে হয় এবং তার স্বাক্ষর নিতে হয়। তথ্য মৌখিকভাবে দিলে তা জেনারেল ডাইরীতে লিখতে হয় এবং তা-ও তথ্য সরবরাহকারীকে পড়ে শুনাতে হয়।

জি, ডি, (জেনারেল ডাইরী- G.D.) কি?

জেনারেল ডাইরী ১৮৬১ সনের ৫ নং পুলিশ আইনের ৪৪ ধারা ও ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪/১৫৫ ধারা মোতাবেক রক্ষিত থানার একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও জরুরী রেজিষ্টার। এটি সাধারণতঃ ২০০ পৃষ্ঠায় হয়। অন্য কথায় এটিকে ষ্টেশন ডাইরী বা রোজ নামচাও বলে। থানা এলাকার যে সব দুর্ঘটনা ঘটে তা এখানে সংক্ষিপ্ত করে পুলিশ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সাধারণ দুর্ঘটনা, ভয়ানক ঘটনা, বিপদের আশংকা, ঘটে যাওয়া বিষয়ের উপর সাধারণ ডাইরী করে রাখা হয়।

এ জেনারেল ডাইরী প্রত্যেক স্থায়ী বা অস্থায়ী থানায়, ফাঁড়িতে, পুলিশ বক্সে, ট্রেজারী গার্ড, ম্যাগাজিন গার্ড ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। এই ডাইরী শুদ্ধ ও সঠিকভাবে লেখার জন্যে থানা বা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার দায়ী থাকেন। এটি কার্বন সংযোগে দু' কপিতে লেখা হয়। পেন্সিল কপি বহির সংগে থাকে এবং কার্বন কপি সার্কেল এ, এস, পি'র অফিসে জমা দিতে হয়। এটি লেখার সময় ও মাসিক ক্রমিক নং ব্যবহার করতে হয়। এটি প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক ও বিচারকগণ তলব করে থাকেন। এটি আদালতে সাক্ষ্য আইনের ৩৫ ধারা মতে সাক্ষ্যরূপে গণ্য হয়। এত অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ, ধৃর্ত বা পলাতক আসামীর নাম ও ঠিকানা এবং যে ধারায় মোকদ্দমা রুজু করা হয় তা' লিখতে হয়।

শপথনামা বা এফিডেভিট (Affidavit) কি?

কোন ব্যাক্তি যদি তার কোন বিষয় যেমন কমানো বা বাড়ানো অথবা বিষয় সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন বিষয়ে শপথপূর্বক ম্যজিষ্ট্রেট, ১ম শ্রেণীর বা নোটারী

www.pathagar.com

পাবলিকের নিকট লিখিতভাবে জানাতে চান তবে তিনি হাজির হয়ে শপথনামার মাধ্যমে তা' জানাবেন। এটিকেই শপথনামা বা এফিডেভিট বলে। এখানে একজন কৌশলীকে অর্থাৎ আইনজীবীকে সনাক্তকারী হিসেবে থাকতে হয়। এফিডেভিট ৩০ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের মাধ্যমে করতে হয়।

রীট (Writ) কি?

রীট বলতে ব্যক্তি স্বাধীনতার এমন এক রক্ষাকবচকে বুঝায় যার বলে একজন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংবিধানের মৌলিক অধিকারে উপর ভিত্তি করে কোন নির্বাহী সরকারী কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী কার্যের বিরুদ্ধে এক বিশেষ শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই রীট প্রয়োগের ক্ষমতা বলেই মৌলিক অধিকার পুনরায় উদ্ধার করা যায়। এই রীটই একজন ব্যক্তিকে আইনের বাইরে আটক রাখার বিরুদ্ধে নির্দেশ প্রদান করে।

রীট পাঁচ প্রকার:

ক) **হ্যাবিয়াস রীট :** হ্যাবিয়াস কার্পাস শব্দের অর্থ হল "স্বশরীরে হাজির করা''। হাইকোর্ট এই ক্ষমতা ভোগ করে অন্যায়ভাবে আটককৃত কিংবা কারারুদ্ধ কোন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করার এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে মুক্তি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে পারে তাবে হাইকোর্ট উক্ত কারারুদ্ধ ব্যক্তির দ্রুত বিচার করার আদেশ প্রদান করেন।

খ) **ম্যান্দামাস বা নির্দেশমূলক রীট :** এই রীটে প্রশাসনিক কিংবা স্থানীয় কোন সংস্থাসহ যে কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত এমন এক নির্দেশকে বুঝায়, যে নির্দেশ বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কোন নির্দিষ্ট কাজ করার কিংবা তা' করতে নিষেধ করার জন্য অথবা উক্ত কার্য সম্পন্ন করা হতে বিরত রাখা যেতে পারে।

গ) **প্রহিবিশন রীট :** এই রীট বলতে হাইকোর্ট কর্তৃক তার অধীনস্থ আদালতসমূহের বিরুদ্ধে এমন এক নিষেধাজ্ঞা জারী করাকে বুঝায়, যে নিষেধাজ্ঞা বলে উক্ত অধীনস্থ আদালত বা আদালতগুলোর এখতিয়ার বর্হিভূত বা এখতিয়ারের অতিরিক্ত কোন কাজ করার অভিপ্রায় বা সিদ্ধান্তকে প্রতিরোধ করা বা রদ করা যায়।

ঘ) **সার্শিয়োবারাই রীট :** নিম্ন আদালত কিংবা আধা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরই এই শ্রেণীর রীট জারী করা হয়। হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট উক্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করার পর বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

ঙ) কুও ওয়ারেনটো রীট : কুও ওয়ারেনটো রীট বলতে হাইকোর্ট কর্তৃক কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন এক বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে বুঝায়, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ হাইকোর্ট সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুও ওয়ারেনটো রীট প্রয়োগ করে থাকে, যিনি অন্যায়ভাবে কোন পদ, স্বাধীনতা কিংবা ভোটাধিকার দাবী করে। হাইকোর্ট পরীক্ষা করে দেখে কোন যুক্তি বা অধিকার বলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার পদ বা ভোটাধিকার লাভ করেছেন কিনা।

চুরি (দন্ড বিধি, ধারা ৩৭৮-৩৮২)

অন্যের জিনিস গ্রহণ করার অভিপ্রায় এবং অবৈধ ও অজান্তে দখলে নেয়াকে চুরি বলে। এই চুরির শাস্তি ৩ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড হতে পারে। গুরুতর চুরি যেমন বাসগৃহ, তাবু বা জলযান হতে চুরি হলে ৩৮০ ধারা মতে যে কোন মেয়াদের ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড ও জরিমানা হতে পারে। কর্মচারী বা ভৃত্য কর্তৃক মালিকের জিনিস চুরির ক্ষেত্রে উপরোক্ত শাস্তি ভোগ করে।

চুরি করার পূর্বে চুরি করার জন্য বা চুরি করে পালায়নের জন্য অনুরূপ চুরি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তিরক্ষার জন্য মৃত্যু ঘটানো বা আঘাত করা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের অথবা মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি করার কিংবা আঘাত করার ভয় সৃষ্টি করার কিংবা নিয়ন্ত্রণ আরোপের ভয় সৃষ্টি করার প্রস্তুতির পর চুরি করলে যে কোন মেয়াদের ৩৮২ ধারা মতে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড ও জরিমান করা হতে পারে।

ডাকাতি (ধারা ৩৯১)

যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যুক্তভাবে দস্যুতা সংঘটিত করে বা দস্যুতা সংঘটনের চেষ্টা করে কিংবা যদি কোন ক্ষেত্রে যুক্তভাবে দস্যুতা সংঘটনকারী বা দস্যুতা সংঘটন প্রচেষ্টারত ব্যক্তিরও অনুরূপ কার্যে ও প্রচেষ্টার সাহায্যকারীর মোট সংখ্যা পাঁচ বা তার অধিক হয় তাহলে অনুরূপ কার্য সংঘটনকারী, প্রচেষ্টাকারী বা সাহায্যকারী প্রতি ব্যক্তি ডাকাতি করছে বলে ধরা হয়। বাংলাদেশ দন্ডবিধির ২৯৬ ধারা মতে ডাকাতির শাস্তি যদি ডাকাতরা খুন করে তবে তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডে কিংবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডে কিংবা ১০ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং অর্থদন্ডও দেয়া যেতে পারে।

হিবা বা দান কি

একজন বয়স্ক সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার সমস্ত সম্পত্তি বা তার আংশিক অংশ তার যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করে দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বল প্রয়োগ বা চাপ বা কুপ্রভাবের ফলে তার দ্বারা যে কোন দান অবৈধ। একটি বৈধ দানের শর্তগুলো হচ্ছে :

www.pathagar.com

ক) দাতা কর্তৃক দান করার উদ্দেশ্য ঘোষণা, খ) গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত দান গ্রহণ করা এবং গ) দাতা কর্তৃক দানের বস্তু গ্রহীতার দখলে ছেড়ে দেয়া।

দান মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। লিখিত দানের দলিল রেজিষ্ট্রিকৃত হতে হয়। অন্যথায় এটি অবৈধ। দানের বিষয়বস্তু গ্রহীতার দখলে ছেড়ে দেবার পূর্বে যে কোন সময় দাতা তার দান বাতিল করতে পারেন। নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া দাতা কর্তৃক দখল ছেড়ে দেবার পরও তিনি তার দান রদ করতে পারেন।

(১) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দানের ব্যাপারে।

(২) দাতা বা গ্রহীতা কোন একজনের মৃত্যুর পর।

(৩) গ্রহীতা কর্তৃক দানের বিষয়বস্তু অন্যত্র হস্তান্তরিত করার পর।

(৪) দানের বস্তু হারিয়ে যাওয়া বা এটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর।

অছিয়তনামা (উইল) কি এবং উইলনামা লিখার নিয়মাবলী

একজন সুস্থ মুসলমান বা যে কোন শ্রেনীর লোক অছিয়ত বা উইল করতে পারেন। কোন মুসলমান তার মৃত্যুর পর দাফন বা দাফনে ব্যয় ও দেনা পরিশোধের পর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী উইল করতে পারেন না। আবার কোন ওয়ারিশের অনুকুলেও উইল করা যায় না। তবে উইলকারীর মৃত্যুর পর তার অন্যান্য ওয়ারিশ এতে সম্মতি দিলে তা কার্যকরী হবে। এক-তৃতীয়াংশের বেশী উইল করা হলে উইলকারীর ওয়ারিশগণ তাতে সম্মতি না দিলে এক-তৃতীয়াংশের বেশী যা করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে উইলটি কার্যকরী করা যাবে। যার জন্ম হয়নি তার নামে উইল করা যাবে না। তবে গর্ভস্থ সন্তানের অনুকূলে উইল করা যাবে। শিশুটির জন্ম উইল করার ছয় মাসের মধ্যে হতে হবে। উইল মৌখিক ও লিখিত যে কোনভাবে করা যায়। মৌখিক উইল যথাযথ আদালতের প্রমাণ লাগে। সাধারণতঃ উইল প্রবেট করতে হয়। মুসলমানের উইল প্রবেট গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে যথাযথ প্রাণিত হলে সাক্ষ্য হিসেবে তা গ্রাহ্য হতে পারে। উইল কার্যকরী করার জন্যে একজন এক্সিকিউটার আবশ্যক। তবে মুসলমান উইলের ক্ষেত্রে মুসলমান ছাড়া হিন্দু, খ্রীষ্টান বা কোন অমুসলমানকে নিয়োগের বিধান রয়েছে। উইলকারীর মৃত্যুর পূর্বেই যদি উইল গ্রহীতার মৃত্যু হয় তবে উইল অসিদ্ধ হবে এবং উইলটি উইলকারীর হবে। শর্ত সাপেক্ষ উইল আইন মতে অসিদ্ধ। উইলকারী যদি এমন কোন কাজ করে যার দ্বারা উইলের বিষয়বস্তুর সাথে কিছু সংযোজিত হয় যার দ্বারা উইলের বিষয়বস্তুতে উইলকারীর মালিকানা স্বত্ব বিলুপ্ত হয়, তবে সেই কার্য দ্বারা উইল রদ করা হয়। কথায় ব্যক্ত করে বা অব্যক্ত ইংগিতের দ্বারা উইল রদ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

পথাধিকার আইন (Easement) আইন

পথাধিকার বলতে এমন এক অধিকার বুঝায়, যা দ্বারা কোন জমির মালিক কিংবা দখলী স্বত্বের অধিকার বলে দখলদার তার জমির উপর বা উহার সম্পর্কে কিছু করতে বা অব্যাহত রাখতে পারে। পথাধিকাারে সংজ্ঞায় বাংলাদেশ পথাধিকার আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে পথাধিকার বলতে এমন এক সুবিধাভোগী স্বত্বকে বুঝায়, যার দ্বারা কোন জমির মালিক বা দখলদার তার জমির সুবিধাজনক স্বত্ব ভোগের জন্য অপর কোন ব্যক্তির জমির উপর কিংবা উহার সম্পর্কে কিছু করতে বা করা অব্যাহত রাখতে অথবা কিছু করা হতে নিবৃত করা অব্যাহত রাখতে পারে।

এক কথায় অন্যের সম্পত্তির উপর কোন সুনির্দিষ্ট অধিকার বা কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ বা অর্জনকেই পথাধিকার বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজ সম্পত্তির উপর একচ্ছত্র অধিকার বা স্বত্ব রয়েছে, এই সকল স্বত্ব বা অধিকার উক্ত জমির মালিকানাধিকার বলে তিনি তার ভূমি শান্তিপূর্ণভাবে ও সুবিধাজনক ভোগ দখলের জন্য তার স্বনিকটস্থ প্রতিবেশীর ভূ-সম্পত্তিতেও কতিপয় বিশেষ অধিকার সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকে। ইহাকেই বলা হয় পথাধিকার বা অন্যের ভূমির উপর দিয়ে চলাচল করার অধিকার।

যে সকল নীতির প্রয়োজনীয়তার দরুণ পথাধিকার দাবী করা যায় তা হচ্ছে-

(১) চরম প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে।

(২) পরোক্ষভাবে প্রদত্ত অধিকারের বলে ইহা সৃষ্টি হতে হবে।

(৩) অপর কোন পথাধিকার এই ক্ষেত্রে থাকবে না।

(৪) প্রয়োজনীয়তার দরুণ একটি মাত্র পথাধিকার দেয়া হবে।

(৫) পথাধিকারটির অস্তিত্ব প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

মানহানি:

সহজে অনেক সময় একজন আর একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা, কুৎসা রটনা করে তার সুনাম নষ্ট করে। এতে ঐ ব্যক্তি সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হন। এইরূপ অপরাধের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির মামলা দায়ের করা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৫০০ ধারায় ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। ক্ষতির পরিমান অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে ৫০০ ধারা অনুযায়ী দুই বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কিংবা অর্থদন্ড কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত করা যায়।

www.pathagar.com

আত্ম-রক্ষার অধিকার:

দেহ ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৯৬ হতে ১০৬ ধারা পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়, নিজের দেহ ও অন্যের দেহ এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। এই কারণে বলা হয়েছে, এই রূপ প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যতটুকু আঘাত অন্যেকে দেয়া প্রয়োজন তা' বিনা দ্বিধায় দিতে পারে। তাই আত্মরক্ষামূলক অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলে গণ্য হবে না। এতে কারো বা যে আক্রমণ করতে চায় আত্ম-রক্ষাকারীর আঘাতে তার মৃত্যু হলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

তুচ্ছ ও বিরক্তিজনক বিষয়:

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫০ ধারায় মিথ্যা, তুচ্ছ ও বিরক্তিজনক অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী/ বাদীর বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা নেয়া যায় তা' উল্লেখ আছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫০ (১) উপধারায় বলা হয় যে, কোন নালিশ, পুলিশ রিপোর্ট বা অন্য কোন সংবাদের ভিত্তিতে রুজ্জুকৃত মামলার বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি সকল বা কোন আসামীকে খালাস বা ডিসচার্জ করেন এবং সন্তুষ্ট হন যে, সে মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা, নগণ্য বা বিরক্তিজনক তবে তিনি খালাসের আদেশের সাথে যে ব্যক্তির নালিস বা সংবাদের ভিত্তিতে মামলার উদ্ভব হয়েছে, সে ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে কেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ দেবার আদেশ দেয়া হবে না তার কারণ দর্শানোর আদেশ দেবেন। সে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকলে সকলের মত কারণ দর্শনো নোটিশ জারী করতে হবে।

২৫০(২) উপধারায় বলা হয় যে, অভিযোগকারীর/ নালিশকারী বা সংবাদদাতা যে কারণ প্রদর্শন করবে ম্যাজিষ্ট্রেট তা বিবেচনা করবেন এবং যদি বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে আনিত অভিযোগ মিথ্যা, তুচ্ছ বা বিরক্তিজনক ছিল তবে কারণ লিপিবদ্ধ করে বাদী কর্তৃক আসামীকে বা আসামীদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে হবে।

২৫০(২-এ) উপধারায় বলা হয় যে ম্যাজিষ্ট্রেট (২) উপধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশের পর ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা হলে মিথ্যা অভিযোগ নালিসকারীকে অনধিক ত্রিশ দিন পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিতে পারবেন।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫০ (৫) উপধারায় বলা হয় যে, ২৫০ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন উপধারা (২) অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্দেশ সম্বলিত আদেশ ছাড়াও ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মিথ্যা নালিসকারীকে ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদন্ড বা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডে দন্ডিত করতে পারবেন।

www.pathagar.com

অপহরণ:

যে ব্যক্তি কোন ব্যাক্তিকে কোন স্থান হতে গমণ করার জোর পূর্বক বাধ্য করে বা কোন প্রতারণামূলক উপায় প্রলুব্ধ করে সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপহরণ করে বলে গণ্য হবে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬২ ধারা বলে।

অপহরণ দুই প্রকারেরর যথা :

(ক) বাংলাদেশ হতে অপহরন : যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে তার অনুমতি ছাড়া বা তার পক্ষে অনুমতি দানে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে নিয়ে যায় তখন তাকে বাংলাদেশ থেকে অপহরণ করা বলে।

(খ) আইনগত অভিভাবক থেকে অপহরণ : যদি কোন স্বাভাবিক মস্তিষ্কে সক্ষম কোন ব্যক্তি চৌদ্দ বছরের কম বয়সের কোন পুরুষকে বা ষোল বছরের কম বয়সের কোন নারীকে তার আইনগত অভিভাবকের অভিভাবকত্ব থেকে উক্ত অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোথাও নিয়ে যায় তখন তাকে আইনগত অভিভাবকত্ব থেকে অপহরণ বুঝায়।

প্রতারণামূলক অপহরণ :

(ক) যে দিকে মহিলাটি যেতেন না, সেই দিকে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা আ' যদি প্রতারণামূলক হয় তবে সেই কাজটি প্রতারণামূলক উপায়ে অপহরণ বলে গণ্য হবে। ভুল বুঝিয়ে নিয়ে যাওয়াও প্রতারণামূলকভাবে অপহরণ বলা যাবে।

(খ) বিবাহ করার বা বিবাহের লোভ দেখিয়ে কোন নারীকে গৃহচ্যুত করা প্রতারণামূলকভাবে অপহরণ বলা হয় (ধারা ৩৬৯দঃবিঃ)।

অপহরণের শাস্তি : যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হতে বা আইনানুগ অভিভাবক হতে অপহরণ করে সেই ব্যক্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবে। তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে। বাংলাদেশে দন্ডবিধি ৩৬১ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিয়ে যাওয়াই হল অপরাধ। ৫০০ গজ দূরে নিয়ে গেলেও অপরাধ। দুই ঘন্টা রাখাও অপরাধ। তবে নিজে গেলে অপরাধ হবে না।

বাংলাদেশ দন্ড বিধি ৩৬৫ ধারা : খুন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ : যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে এইরূপ উদ্দ্যেশ্যে অপহরণ বা হরণ করে যাতে অনুরূপ খুন হতে পারে বা তার এই ব্যবস্থাপনা বা যাতে সে খুনের বিপদ কবলিত হতে পারে। সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তদপুরি অর্থদন্ডনীয় হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারা (ক) : দশ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করা: যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে দশ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরণ করে যে ঐ ব্যক্তিকে খুন করা যেতে পারে বা গুরুতর আঘাত করা যেতে পারে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ডও হবে।

কোন ব্যক্তি গোপনভাবে বা অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ : যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে, অবৈধভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে তাকে অপহরণ করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ দন্ড বিধির ৩৬৬ধারা : কোন নারীকে বিবাহ ইত্যাদিতে বাধ্য করার নিমিত্তে অপহরণ বা প্রলুব্ধকরণ : যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করা যেতে পারে এইরূপ অভিপ্রায় বা তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কিংবা তাকে অবৈধ কোন যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তাকে অবৈধ কোন যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধের সম্ভাবনা রয়েছে জেনে অপহরণ করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনায় কারদন্ডে যার মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তাকে অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি কোন নারীকে এই বিধিতে বর্ণিত অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন বা ক্ষমতা অপব্যবহারের সাহায্যে বা বাধ্যবাধকতার কোন উপায়ে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে জেনে তাকে স্থান থেকে গমণ করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে জেনে তাকে কোন স্থান থেকে গমণ করতে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তিও পূর্বোক্তব্য দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা সংগ্রহকরণ : (বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৬ ধারা) যে ব্যক্তি কোন উপায়ে ১৮ বছরের কম বয়সের কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে এইরূপ অভিপ্রায় বা সম্ভাবনা রয়েছে জেনে কোন স্থান হতে গমণ করতে বা কোন কাজ করতে প্রলুব্ধ করে যে অনুরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা যেতে পারে সেই ব্যক্তির দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে বা অর্থদন্ড হতে পারে।

বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬১ ধারা : দেহাবরণ চুরি করার উদ্দেশ্যে দশ বছরের কম বয়স্ক শিশু অপহরণ করণ : যে ব্যক্তি দশ বছরের কম বয়স্ক কোন শিশুর দেহ হতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে ছিনিয়ে নেবার অভিপ্রায়ে অনুরূপ শিশুকে অপহরণ করে সে ব্যক্তি সাত বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

www.pathagar.com

হত্যা:

নরহত্যা দুই প্রকারের হয়

(ক) দন্ডাই নরহত্যা (খ) আইনানুগ নরহত্যা

দন্ডাই নরহত্যা:

যে ব্যক্তি কোন কার্যের সাহয্যে মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায় বা মৃত্যু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ দৈহিক জখম ঘটাবার অভিপ্রায় উক্ত কার্যের সাহায্যে যে মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে জেনে অনুরূপ কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটায় সে ব্যক্তি দন্ডাই নরহত্যা অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলে গণ্য হবে। তবে খুন করতে গেলে অবশ্যই দন্ডই নরহত্যা হতে হবে (বাংলাদেশ দন্ডবিধি ২৯৯ ধারা)।

আইনানুগ নরহত্যা আবার দুই প্রকার

(১) অপরাধমূলক অভিপ্রায়ের অনুপস্থিতে আকস্মিক দূর্বিপাকে দুর্ঘটনার সময় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো।

(২) কোন শিশু উন্মাদ বা মাতাল ব্যক্তির দ্বারা মৃত্যু ঘটানো।

মৃত ব্যক্তির উপকারার্থে তার সমর্থণযোগ্য নরহত্যা ছয় প্রকার

(১) সৎ বিশ্বাসে তথ্য প্রাপ্তির কারণে নিজেকে বাধ্য জেনে নরহত্যা করা।

(২) সৎ বিশ্বাসে বিচারাসনে বসে বিচারক কর্তৃক আইন বলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো

(৩) আদালতের রায় বা আদেশের অনুকুলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো।

(৪) আইন বলে সমর্থিত বা আইনের সমর্থন আছে বিশ্বাস করে মৃত্যু ঘটানো।

(৫) অপরাধমূলক অভিপ্রায় ছাড়া সৎ বিশ্বাসে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু ঘটানো।

(৬) কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তি রক্ষার্থে মৃত্যু ঘটানো।

কার্যক্রম : আমলযোগ্য, ওয়ারেন্ট হবে, জামিনযোগ্য এবং আপোষযোগ্য নহে। আদালতে বিচারযোগ্য। বর্তমানে এসিড নিক্ষেপ এর উপর এমন আইন করা হয়েছে যে এসিড নিক্ষেপকারীর শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদন্ড।

বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৩০০ধারায় কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবার জন্যে আঘাত বা কাজ করে বা অভিসন্ধি করে বা আঘাতের ফলে মৃত্যু হবে। এই রূপ খুনের শাস্তি বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন দন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

www.pathagar.com

জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় ও শাস্তি

(১) কাকেও তার নিজের বা অপর কারও মৃত্যুর ভয় বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায় করলে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৩৮৩ ধারা মতে দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড ও জরিমানা হবে।

(২) আবার কাকেও মৃত্যুর বা গুরুতর আঘাতের ভীতি প্রদর্শণ করলে ৩৮৩ ধারা মতে ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড ও জরিমানা হবে।

(৩) কাকেও তার নিজের বা অপর কারও বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডে. দশ বছর পর্যন্ত যে মেয়াদের করাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ করার বা তার চেষ্টা করার বা কাকেও অনুরূপ অপরাধ করতে প্রবৃত্ত করার অভিযোগ উত্থাপনের ভয়ে অভিভূত করার কারণে দশ বছর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা জরিমানা হবে।

(৪) জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায়ের উদ্দেশ্যে কাকেও তার নিজের বা অপর কারো বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডে দন্ডনীয় বা দশ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ করার বা তার চেষ্টা করার অভিযোগ আনয়নের ভীতি প্রদর্শন করা বা ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা দশ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা জরিমানা হবে।

দন্ডবিধি ৪২০ ধারা:

৪২০ ধারা বলতে বাংলাদেশ দন্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত একটি অপরাধজনক ধারাকে বুঝায়। প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করতে প্ররোচনা করা এ ধারার প্রধান বিষয়বস্তু। ৪২০ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সাত বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং অর্থদন্ডও করা যায়।

সমাজিক দ্বন্দ্ব/ বিরোধ:

ভূমিকা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন মানব জীবনের চির আকাংখা। কিন্তু আকাংখা থাকলেই মানুষ সব সময় একত্রে মিলেমিশে বসবাস করতে পারে না। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, " এক ভুল করতে পারে না স্বর্গীয় দূত/ ফেরেশতা এবং আর এক শয়তান''। মানুষ ফেরেশতা বা শয়তান কোনটাই নয়। তাই তার পক্ষে ভুল করা, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি. দলাদলি, কোন্দল, অশান্তি করা স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলো নিয়েও মানুষ আবার সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। এগুলো মীমাংসা তাই মানুষের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। নিম্নে এ সব সামাজিক দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা হলো:

www.pathagar.com

ক) সামাজিক দ্বন্দ্ব কি?

মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। সমাজ জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার পক্ষে সব সময় এ সব প্রয়োজন সঠিকভাবে মিটানো সম্ভব নয়। ফলে অশান্তির সৃষ্টি এবং এতে সমাজিক সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ব্যহত হয়। মানুষের এ ধরণের বিশৃংখলা ও অস্বাস্থ্যকর কার্যকলাপকেই সমাজিক দ্বন্দ্ব বলা হয়।

কি কি কারণে সামাজিক দ্বন্দ্ব হয়?

মানুষ এমন একটি স্বাধীন প্রাণী যে, সে তার ভাল-মন্দ সব কিছুই বুঝতে পারে। এ স্বাধীন মানুষ নিজের বিবেক প্রসূত জ্ঞান দিয়ে ভাল পথে পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু তা' সে সব সময় করতে পারে না। তার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথা : চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক এবং ষড় রিপু : অহংকার, লোভ, কাম, ক্রোধ, ও আলস্য রয়েছে। এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষড় রিপুর কারণে মানুষ স্বার্থপর ও স্বার্থান্বেষী এবং এগুলোর তাড়নায় যখন বিপথে পরিচালিত হয় তখনই তাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। উপরন্তু ফৌজদারী আইনানুযায়ী দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজন (১) দুষ্টমন, (২) ইচ্ছা (৩) অভিপ্রায় (৪) অপকারেচ্ছা, (৫) অবহেলা, (৬) আইনগত ত্রুটি এবং (৭) ঘটনাজনিত ত্রুটি। বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারায় বর্ণিত আছে খুন করা যেমন অপরাধ খুন করার চেষ্টাও ঠিক অনুরূপ অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। আবার বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৯৬ হতে ১০৬ ধারা পর্যন্ত বলা আছে :

(১) নিজের দেহ ও সম্পত্তি রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে।

(২) এরূপ প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি যতখানি আঘাত অন্যকে দেয়া প্রয়োজন তা বিনা দ্বিধায় দিতে পারে। অর্থাৎ আঘাত এবং আক্রমণ বা তাদের উদ্বেগজনক মারাত্মক আস্ফালন আসলে তবেই প্রত্যাঘাতের অধিকার জন্মে। তাই দন্ডবিধিরর ৯৬ ধারায় বলা হয়েছে যে আত্মরক্ষামূলক অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ও আলোচ্য ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু এবং ফলাফল:

সমাজের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটতে পারে। সামাজিক দ্বন্দ্বের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয় তার মধ্যে এর কিছু পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। এগুলোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘটিত হতে পারে। এগুলোর কিছু নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করছি :

www.pathagar.com

(১) পারিবারিক দ্বন্দ্ব : সমাজের ভিত্তি হল পরিবার। সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে একক পরিবার থেকে শুরু করে গোটা বিশ্ব মানব পরিবার উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু সামজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত কারণে মানব পরিবার বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন সমাজে, রাষ্ট্রে পরিবারিক রূপ , সংজ্ঞা, চাহিদা, পরিবর্তন, পরিবর্ধণ হয়ে আসছে। যার ফলে পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে হচ্ছে :

(ক) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, একজন কর্তৃক অন্য জনের উপর কর্তৃত্ব, সন্দেহ, শোষণ, অত্যাচার, মতাদর্শ, চাপিয়ে দেয়া, মারপিট, এমনকি খুন করা হয়। উপরন্তু, বর্তমানে যৌতুক দাবী ও যৌতুকের জন্য অত্যাচার ও আত্ম-হত্যার মত ঘটনা দেখা যাচ্ছে। একাধিক তালাক, বিয়ে এমনকি তাদের মধ্যে গোপনে অবৈধ যৌনাচারও এ দ্বন্দ্বের কারণ।

(খ) পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব : সন্তান অনেক সময় পিতামাতার কথা শুনে না। আবার পিতা-মাতাও অনেক সময় সন্তানের মন-মানসিকতা না বুঝে তাদের একপেশে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। যেমন ছেলেমেয়েদের মতামত না নিয়ে তাদের অন্যত্র বিয়ে ঠিক করা, ইত্যাদি। এতে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

(গ) বৌ-শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-জা, দেবর, ভাশুরের মধ্যে দ্বন্দ্ব : বর্তমান সমাজিক প্রেক্ষাপটে একটি মেয়ে অন্য বাড়ীর বৌ হয়ে যায়। কিন্তু সমাজে এমনও দেখা যায় ঐ বাড়ীতে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-জা, দেবর, ভাশুর ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন মিলিতভাবে ঐ বৌয়ের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। যেমন নতুন অল্প বয়সী বৌয়ের চাল-চলন, কথাবার্তা নিয়ে কথা উঠে। ভুল করলে স্বামীকে নানাভাবে ফুসলিয়ে স্ত্রীকে বকা বা মার খাওয়ানো, অথবা যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া হয়। আবার দেবর, শ্বশুর বা ভাশুর দ্বারা উক্ত স্ত্রী মাঝে মাঝে ধর্ষিতাও হয়। এগুলোর ফলে সামাজিক দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে।

(ঘ) আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব : অনেক সময় নিকট বা দূর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, স্বার্থ ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যেমন সব জামাইকে শ্বশুর বাড়ীর লোকজন তেমন আদর আপ্যায়ন করে না বা আমল দেয় না। এতে উক্ত জামাই তার স্ত্রীর উপর উক্ত কারণে নির্যাতন চালায় যেন বিড়ালের রাগ ঘরের ভাঙ্গা বেড়ার সাথে।

(২) ভূমি/ সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব : আদিম সমাজ ব্যবস্থার পর থেকে মানুষের অস্তিত্বের কারণে জমি বা সম্পত্তি দখলের জন্য সবচেয়ে বেশী দ্বন্দ্ব চলে আসেছে। এ দ্বন্দ্ব যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ভূমি/ সম্পদ প্রাথমিক দিকে গোত্রের নেতার অধীনে ছিল।

www.pathagar.com

তারপর আসে ব্যক্তি মালিকানাধীন। ব্যক্তি মালিক ঐ সম্পদ পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারকে (সন্তানদেরকে বা সন্তান না থাকলে নিকট আত্মীয়-স্বজনকে) দিয়ে যেত। এ নিয়ম এখনও চলে আসছে।

(ক) **সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে দ্বন্দ্ব :** এ সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, পিতার সাথে পুত্রের, কন্যার, মাতার সাথে পুত্রের, কন্যার, আবার ভাইয়ে-ভাইয়ে, ভাই-বোনে চলে আসছে। এর ফলে মারামারি, খুন-খারাবী পর্যন্ত বাংলাদেশে অহরহ ঘটছে।

(খ) **জমি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দ্বন্দ্ব :** এ জমি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব হচ্ছে তেমনি নিকট বা দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কম দ্বন্দ্ব ঘটছে না। নানারকম বৈধ বা অবৈধভাবে এ সম্পত্তি পাওয়ার জন্য মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করছে। যেমন ভাগিনা মামা বাড়ির এবং কন্যা বিয়ের পর বাপের বাড়ির সম্পত্তি পেতে চায়।

(গ) **সম্পত্তি নিয়ে পাড়া-পড়শীর মধ্যে দ্বন্দ্ব :** পাড়া-পড়শীরাও অনেক সময় হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ওঁত পেতে থাকে কোনভাবে অন্যের সম্পত্তি/ জমি দখল করে নিতে পারে কিনা। এ জন্য পাড়া-পড়শীরা দলাদলি, ভুয়া পর্চা, নকসা, দলিল, কাগজ-পত্র তৈরি, মিথ্যে টিপসহি নেয়া, মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত করে। ফলে সমাজে দ্বন্দ্ব ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

(ঘ) **জমি নিয়ে এক এলাকার সাথে অন্য এলাকার দ্বন্দ্ব :** এ ভূমি/ সম্পত্তি দখল নিয়ে ইতিহাসে অনেক অঘটন ও প্রাণহানি ঘটেছে। এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের এমনকি এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ভূমি ও সম্পত্তি দখলের জন্য যুদ্ধ করেছে। এতে অনেক জীবন ও জানমালে র ক্ষতি হয়েছে। ইতহাসে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। এখনও যে উত্তর গোলার্ধ-দক্ষিণ গোলার্ধ, উন্নত বিশ্ব ও উন্নয়নশীল বিশ্ব, ধনী দেশ গরীব দেশ, প্রথম বিশ্ব, দ্বিতীয় বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্ব, এমনকি চতুর্থ বিশ্ব, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপস্থিতি তা' এ সম্পদের উপর ভিত্তি করেই রচিত। সভ্য সমাজের সভ্য মানবতার নামে যেন এ এক অসভ্য বর্বরতার তান্ডব লীলাখেলা। দুর্বলের উপর সবলের একি বিকট ও কুৎসিৎ সুন্দরের খেলা। সমাজ জীবনের এ পাশবিক দ্বন্দ্ব সত্যি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার কাছে হার মানে।

(৩) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব : দেশকে পরিচালনার জন্য দেশে রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রতিটি দলের নির্দিষ্ট মেনিফেষ্টো থাকে এবং সেই মেনিফেষ্টো অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় উঠে পড়ে লেগেছে। এতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, প্রতিপক্ষকে হয়রানি, আঘাত, খুন করা যখন যা প্রয়োজন তখন সেই মাধ্যমেই গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে সমাজ জীবণ রুগ্ন হয়ে পড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

স্থবিরতা লক্ষ্যনীয়। জনগণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হতে অনীহা প্রকাশ করছে। ফলে অনেক সময় ভুয়া, অযোগ্য লোক ক্ষমতায় আরোহণ করছে। তারা দেশের উন্নয়ন করতে না পারলেও দেশের লোকজনের বারোটা ঠিকই বাজিয়ে দিচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। জনগণ জীবন মরণের তাগিদে বিভিন্ন অসৎ পন্থায় অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত। এতে সমাজের মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটছে। এভাবে মানুষের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করছে। মানুষ ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ছে যেন যে কোন সময় বারুদের আগুন জ্বলে উঠবে। এ অসহনশীল পরিস্থিতি সমাজের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ।

৪) সমাজিক জীবনে অস্থিরতা : সমাজ জীবনের অস্তিরতা সমাাজিক দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে সেই যুগ লক্ষণগুলো আজও সুস্পষ্ট। বর্তমানে সভ্যতার বিকাশ ঘটলেও মানুষের মননশীলতা ও মানবীয় গুনের বিকাশ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই প্রাগৈতিহাসিক ও বর্বরতারর যুগের সহিংসতা, পাশবিকতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, সন্ত্রাস, হত্যা,ধর্ষণ, ভ্রুণ-হত্যা, হাইজ্যাক, খুন, লোভ, গর্ভপাত, যৌনাচার, মৌলবাদ, অর্থ ও ক্ষমতার মোহ, নৈতিকতার অবক্ষয় তথাকথিত সভ্যতার এ যুগে অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রকটতর রূপ লাভ করেছে। ফলে সভ্যতার খোলসে মানুষের আসল রূপ যে বিপন্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ রূপের উন্মোচন ঘটা যেন যে কান মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র।

৫) দ্বন্দ্ব সমাধানের গোড়াতেই দ্বন্দ্ব : প্রবাদ বাক্য আছে, "ভূত ছাড়াতে গিয়ে সরষে বীজ প্রয়োজন, এতে নাকি ভূত চলে যায়'' কিন্তু আমাদের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য যে সকল আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর মধ্যেই নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। পুলিশের সামনে মাস্তানরা নিরীহ লোককে মেরে টাকা নিয়ে চলে যায়। সন্তান তার পিতাকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের সাহায্য প্রার্থণা করে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী অনেক সময় বড় নির্বিকার। থানায় কেইস করতে গেলে টাকা ছাড়া কেইস নিতে চায় না। অথবা উক্ত এলাকায় যে অপরাধ ঘটে না তা দেখানোর জন্য কেইস নেয়া হয় না। সংসদে বিল পাস হয় কোন বিশেষ ব্যক্তিকে রক্ষার প্রয়োজনে গুলি করা যাবে নির্বিচারে। তার জন্য কোন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না। মানুষ অন্যায় করুক বা না করুক বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাকে আটক করে জেলে পুরে রাখা যাবে। কি ভয়ানক আইন। এ যেন সরষে বীজের ভিতরেই ভূত। কাজেই সরষে বীজ দিয়ে আর কিভাবে ভূত ছাড়নো যাবে? উপরন্তু, অনেক সময় আদালতে দীর্ঘসূত্রীতা, প্রচুর অর্থ ব্যয়, ন্যায় বিচার না পাওয়া, নির্দোষ ব্যক্তি বিচারে সাজা পাওয়া ইত্যাদি কারণে মানুষ আজ আর আদালতের ধারে কাছে যেতে চায় না। এ সকল কারণে আদালতে বছরের পর বছর অনেক মামলা জমা হয়ে আছে। তাই আজ মানুষ আর আদালতের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সমাধানের ভরসা পাচ্ছে না। তারা বিকল্প পথ খুঁজছে।

www.pathagar.com

৬) দ্বন্দ্ব সমাধানের পদ্ধতি :

মানব জীবনে যে সকল দ্বন্দ্ব/ সমস্যা রয়েছে তা নিরসের জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রচলিত দৈনন্দিন আইন রয়েছে। যেমন:

(১) ফৌজদারী আইন/ দন্ডবিধি আইন।

(২) দেওয়ানী আইন/ সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত।

(৩) পারিবারিক আইন।

(৪) শ্রম আইন।

(৪) সালিসী পদ্ধতি, ইত্যাদি।

আমরা আগেই দেখেছি আদলতের দীর্ঘসূত্রীতা, প্রচুর অর্থ ব্যয়, ন্যায় বিচার না পাওয়া ইত্যাদির কারণে মানুষ আদালতের প্রতি আস্থা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতি তো চলতে পারে না। তাদের মধ্যে যে সকল সামাজিক সমস্যা, দ্বন্দ্ব, অস্থিরতা ইত্যাদি রয়েছে তার মীমাংসা তো প্রয়োজন। এ কারণে মানুষ চাচ্ছে এমন পদ্ধতির ব্যবস্থা যেখানে তারা পাবে তাদের দ্বন্দ্বের সঠিক সমাধান ও ন্যায় বিচার। জাতিসংঘ, আমেরিকাসহ বিশের অনেক উন্নত দেশে আজও দেখা যায় তারা তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সালিসী ব্যবস্থায় (Mediation) মাধ্যমে সমাধান করে আসছে। কারণ এ সালিসী পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বন্দ্বের দ্রুত সমাধান হয়, ন্যায় বিচার পাওয়া যায়, তেমন কোন খরচ লাগে না, বাদী ও বিবাদী উভয়ে এ ব্যবস্থায় সুখী থাকে, মানুষের মানবিক দিক দেখা হয় এবং এর মাধ্যমে সমাজে আবার বাদী ও বিবাদী উভয়ে পরস্পর পূর্ণ শান্তি নিয়ে বসবাস করতে পারে। এতে বাদী বিবাদীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে না বরং ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভবিষ্যতে আরও কোন দ্বন্দ্ব এ পদ্ধতির মাধ্যমে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল সালিসী পদ্ধতি। এ সালিসী পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ তাদের দ্বন্দ্ব সমাধান করে সুখী-সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে। পরবর্তীতে এ সালিসী পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

উপসংহার : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে মানুষ একে অন্যের সহযোহিতায় ও সহমর্মিতায় পথ চলে । কিন্তু এ পথ চলতে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব, সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আর সঠিক সময়ে এ দ্বন্দ্ব নামক রোগের সঠিক চিকিৎসাই মানুষকে দিতে পারে অনাবিল সুখ ও শান্তি। আর তা "সালিসী পদ্ধতির'' মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। সালিসী ব্যবস্থায় মানুষের দ্বন্দ্ব সমাধান করা হলে আমাদের সমাজে যে পুঞ্জীভূত সমস্যা রয়েছে তা অরিচরেই সমাধান হবে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। সেই আশা মানব সমাজের আছে। কারণ সালিসী ব্যবস্থার মাধ্যমেই বিশ্ববাসী প্রেম, শান্তি ও আনন্দ নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারছে।

www.pathagar.com

পুলিশ এবং তার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব

পুলিশ হলেন সমাজ জীবনে শান্তি রক্ষার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি। ইংরেজীতে এই পুলিশ শব্দের অর্থ হচ্ছে: Police: P=Polite, O=Obedient, L=Loyal, I=Intelligence, C=Courageous and E=Efficient.

আইন রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।বিশেষভাবে ফৌজদারী আইন প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। পুলিশ অপরাধ দমনে সক্রিয় থাকে। পুলিশ সমাজ জীবনে শান্তি রক্ষায় শান্তির দূতের ন্যায় কাজ করে। কিন্তু বাস্তবতা বড় রূঢ়। তাই দেখা যায় পুলিশের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সব অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ সব সময় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সাধারণত: যে সব অপরাধের ফলে মানুষের বিশেষ ক্ষতি হয় সে সব অপরাধ দমনে পুলিশ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নিজ থেকে অপরাধীকে আটক করতে পারবে। ফৌজদারী আইনের ৪৬নং ধারার (১) নং উপধারা মতে অপরাধীকে দেহ স্পর্শ করে বা কাঁধ স্পর্শ করে তাকে আটক করতে পারে। এই ধারার জন্য কোন অপরাধী ব্যক্তি যদি তাকে বলপূর্বক বাঁধা দেয় অথবা গ্রেফতার এড়াতে চায় তবে পুলিশ তাকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে।

কোন কোন কারণে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারে:

৫৪ ধরার বিধান মতে বিশেষ অবস্থায় পুলিশ ৯টি কারণে বিনা ওয়ারেন্টে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে:

১. গুরুতর অপরাধ যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী শিশু পাচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে।
২. আইন ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া যদি কারো কাছে ঘর ভাঙ্গার জিনিস পাওয়া যায়।
৩. যে ব্যক্তিকে ফৌজদারী আইন অনুযায়ী আদালত বা সরকার অপরাধী বলে ঘোষণা করেছে।
৪. যে ব্যক্তির নিকট চুরি হওয়া মাল রয়েছে এবং তাকে চুরির সাথে জড়িত থাকার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে বলে মনে হয়।
৫. পুলিশ অফিসারকে তার কাজে বাঁধা দানকারী ব্যক্তি যে, কোন আইনসঙ্গত হেফাজত হতে পলায়ন করেছে বা পলায়ন করার চেষ্টা করে।
৬. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমান বাহিনী হতে পলায়নকারী কোন ব্যক্তিকে।
৭. এমন ব্যক্তিকে যে বাংলাদেশের বাইরে এমন কাজ করছে বা কাজের সাথে জড়িত যে ধরণের কাজ বাংলাদেশে করলে বা কাজের সাথে জড়িত থাকলে তাকে গ্রেফতার করা যায়।

www.pathagar.com

৮. দন্ডভোগের পর মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী আবার অপরাধ করলে বা ৫৬ (৩) বিধি ভাঙ্গলে।
৯. যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য অপর কোন পুলিশ অফিসারের নিকট হতে অনুরোধ পত্র পাওয়া গিয়েছে, এমন কোন ব্যক্তিকে আইনসঙ্গতভাবে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যেতে পারে।

বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ কি কাউকে গ্রেফতার করতে পারে:

সাধারণ নিয়ম হল কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তাকে ওয়ারেন্ট দেখাতে হবে। তবে উপরোক্ত ৯টি কারণে পুলিশ বাংলাদেশ ফৌজদারী আইনের ৫৪ ধারায় বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে।

বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের পর পুলিশের করণীয়:

১. গ্রেফতার করার পর ২৪ ঘন্টার বেশী কাউকে পুলিশ নিজ হেফাজতে রাখতে পারে না।
২. ২৪ ঘন্টার মাঝেই পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজিরের জন্য যাতায়াতের সময়টুকু ২৪ ঘন্টার মধ্যে যুক্ত হবে না।
৩. ২৪ ঘন্টার বেশী আটক রাখা প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই ম্যাজিষ্ট্রেটের জ্ঞাতসরে রাখতে হবে।
৪. তদন্তের স্বার্থে ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে ১৫ দিন পুলিশের আয়ত্তের অধীনে রাখতে পারে। তবে ১৫ দিনের বেশী কোন মতেই নয়।
৫. কাউকে গ্রেফতারের পর সে পুলিশের হেফাজতে বা আদালতের এখ্তিয়ারে যেখানেই থাকুক না কেন, তার আটক আদেশ শেষ হওয়ার আগেই তাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে।
৬. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সাথে পুলিশ দুর্ব্যবহার করতে পারবে না বরং ভাল ব্যবহার করবে।
৭. কাঁধে হাত দিয়ে তাকে গ্রেফতারের সংবাদ জানাবে।
৮. যে কোন অবস্থাতে পুলিশ কাউকে আঘাত বা মারধোর করতে পারবে না।
৯. একজন মানুষ কেবল আদালত প্রদত্ত সাজাই পেতে পারে। অন্য কোন সাজা নয় বা মারধোর কোন মতেই প্রাপ্য নয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির করণীয়:

পুলিশ যদি ভুলক্রমেও কাউকে গ্রেফতার করে তবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বল প্রয়োগ করবে না। কারণ বল প্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি করলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ফৌজদারী আইনের আওতায় অভিযুক্ত হবে। তবে গ্রেফতারের সময় একজন ব্যক্তি অবশ্যই

www.pathagar.com

পুলিশের কাছে জানতে চাবে কি কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যখন ওয়ারেন্টসহ গ্রেফতার করা হবে তখন সে ওয়ারেন্ট দেখাতে আইনত বাধ্য। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তার নিজের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর দিতে পারে। এই ছাড়া নিজের আইনজীবী ছাড়া অন্য কারো সাথে তেমন কথা না বলা ভাল। সে আইনজীবী নিয়োগ করতে এবং জামিনের আবেদন করতে পারবে। গ্রেফতারের পর তার অন্য কোন বিবৃতিতে সই করা উচিত নয়। পুলিশের সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিরবতা বজায় রাখা উত্তম।

জামিনার্থে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় (যদি সে নির্দোষ হয়):

কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে বা বিনা কারণে গ্রেফতার হয় তবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
২. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যেন মারধোর না করে সেজন্যে পুলিশের প্রতি লক্ষ্য রাখা।
৩. ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সাথে সাথে গ্রামের গণ্যমান্য লোকজন গিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া।
৪. নির্দোষ ব্যক্তিকে যেন ছেড়ে দেয় তার জন্যে থানায় গ্রামের লোকজন গিয়ে প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করা এবং এমনকি প্রয়োজনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারে।
৫. মিথ্যা গ্রেফতারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা।
৬. সাংবাদিকসহ সর্বমহলে মিথ্যা গ্রেফতারের বিষয়ে অবগত এবং সংবাদপত্রে এই বিষয়ে লেখা প্রকাশ করা।
৭. বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহার করে মিথ্যা গ্রেফতারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া।

পুলিশ কি অনুমতি ছাড়া যে কোন নগরিকের ঘরে প্রবেশ করতে পারে:

কোন পুলিশ সাধারণত ওয়ারেন্ট ছাড়া কোন নাগরিকের ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। গভীর রাত্রে যদি কোন ব্যক্তির বাড়ীতে এসে কোন লোকের ঘরে পুলিশ ঢুকতে চায় এবং কাউকে গ্রেফতার বা ঘর তল্লাশী করতে চায় তবে পুলিশকে তা করতে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তাই যে কোন নাগরিক তল্লাশী ওয়ারেন্ট পুলিশের কাছ হতে দেখার অধিকার ভোগ করে। আর পুলিশ তল্লাশী ওয়ারেন্ট দেখাতে বাধ্য। তবে তল্লাশী ওয়ারেন্ট থাকলে পুলিশ ঘরে প্রবেশ করে তল্লাশী করতে পারবে। তখন বাড়ীর মালিক অনুমতি না দিলেও পুলিশ ঘরে ঢুকতে পারবে।

www.pathagar.com

সালিসী ধারণা
সালিসী বিবাদ নিরসনের একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি

সালিসী কি?

এক শুভ লগ্নে এ পৃথীবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটে। আর তখন থেকেই মানব জাতি সমাজে সুখ-শান্তি, আনন্দ ও নিরাপদে বসবাস করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তার জন্য তাদের ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পদ্ধতি। কখনও যদি কোথাও কোন অশান্তি ঝগড়া, বিবাদ- বিসম্বাদ দেখা দিত তবে তারা সালিসী পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার মীমাংসা করে সকলে মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতো এবং সবাই সমাজে নিরাপদে ও পরম শান্তিতে বসবাস করত। তারা পরিচালিত হত প্রেম, শান্তি ও বিবেকের আইন দ্বারা। সম্ভবতঃ সালিসীই মানব সমাজে বিবাদ নিরসনের সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা।

কিন্তু মানব সমাজের ক্রম বিবর্তনের ফলে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন আইনের সৃষ্টি হয়। এর ফলে অনেক সময় এ সকল আইনের মারপ্যাচে এবং ফাঁক-ফোকরের কারণে সমাজের মধ্যে অনেক নিরাপরাধ নির্দোষ লোক শাস্তি পেতে থাকে এবং প্রকৃত অপরাধী চক্ররা শাস্তি না পেয়ে অবাধে বিচরণ করতে থাকে। এতে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে। এরূপ প্রেক্ষাপটেই যুগের অনুভূত প্রয়োজনে মানব সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, সালিসী ব্যবস্থাই একমাত্র উত্তম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যে পদ্ধতি বর্তমান এ যান্ত্রিক যুগে বিবাদরত দু পক্ষের সমস্যা মীমাংসা করে শান্তি স্থাপন করতে পারে। এ কারণে এ সালিসী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জানা প্রয়োজন এবং তা' প্রয়োগ করে সমাজে শান্তি স্থাপন করা আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব।

সালিসী ব্যবস্থা কি?

সালিসী একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যাতে বিবাদরত দুটি পক্ষ বা দল তাদের সমস্যসমূহ সমাধানের উদ্দেশ্যে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি বা সালিসী দলের উপস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত হয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য একত্রে বসে। এখানে বিবাদরত দুটি পক্ষই নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি বা সালিসী দলের উপস্থিতিতে বিবাদ মীমাংসা করতে রাজী বলে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা দল তৃতীয় পক্ষীয় সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তিনি হয়ে দাড়ান বিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী এবং তিনি দুটি পক্ষের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সম্ভাব্য বিকল্প পথ দেখিয়ে দনে। সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা' হল তিনি নিজে বিরোধের ক্ষেত্রে সমাধানটা করে না দিয়ে তাদের নিজেদেরকেই তা' খুঁজতে সাহায্য করেন। এ সালিসী একটি উত্তম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা কারণ এখানে দুটি পক্ষই বিবাদ মীমাংসার মনোভাব নিয়ে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার মূল উচ্ছেদ করে শান্তি স্থাপন

www.pathagar.com

করেতে আগ্রহী থাকে। এখানে কারো জয় বা পরাজয়ের মনোভাব থাকে না। অল্প সময়ে কম খরচে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সমস্যার সমাধান হয়। এ ব্যবস্থা যেহেতু অত্যন্ত খোলামেলা ও চেনা পরিবেশে হয় সেহেতু সকলেই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। এখানে কোর্টের ন্যায় তেমন কোন ভয়-ভীতি থাকে না। সকলেই তাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারে। সালিসী ব্যবস্থায় সমস্যাকে অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখা হয়, এর বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক বিশ্লেষণ এবং দেখে সঠিক সমাধানের জন্য উভয় পক্ষ মিলিত সিদ্ধান্তের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে। সালিসীতে সমস্যার মীমাংসায় যেহেতু দুটো পক্ষই সমাধানে খুশী থাকেন সেহেতু ভবিষ্যত সমাজ সকল পক্ষের কাছেই নিরাপদ ও শান্তিময় হয়ে উঠে।

সালিসী ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট:

মানুষ সামাজিক জীব। সে সমাজে একাকী বসবাস করতে পারে না, আর এ কারণেই সে সৃষ্টি লগ্ন থেকে একতাবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। এ সমাজ মানুষের জীবনে এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সমাজে বসবাস করে মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা : অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার প্রয়োজন মিটায়। সমাজ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দেয়। সমাজ মানুষকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হতে সাহায্য করে। সমাজ মানব জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

এ সমাজেও মানুষ বিভিন্ন প্রতিকূলতার শিকার হয়। বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ-ঝগড়া, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। এতে মানুষের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং এগুলোর নিরসনের ব্যবস্থাও সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে। এগুলো মীমাংসার জন্য অনেকগুলো ব্যবস্থার মধ্যে সালিসী মধ্যস্থতা এ চিরায়ত শ্বাসত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক, সুন্দর এবং সুষ্ঠু বিধান। সমাজে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, হৃদ্যতা এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে সালিসী ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সালিসী বিবাদ-কলহ নিরসনের একটি অন্যতম বাস্তব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

বর্তমানে প্রচলিত কোর্ট-কাচারী, উকিল ইত্যাদির পাশাপাশি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এ সালিসী ব্যবস্থা হাজার বছর ধরে চলে আসছে। এ ব্যাপারে প্রথমেই যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হলো সালিসী বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা হরহামেশাই দেখতে পাই কোন গ্রামে বা শহরের কোন মহল্লায় সালিসী বসছে এবং মাতবর সর্দার জাতীয় কেউ দুই পক্ষের কথা শুনে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে রায় দিয়ে এক পক্ষকে জিতিয়ে দিচ্ছে। এ পদ্ধতি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, ইংরেজীতে এ পদ্ধতিকে আরবিট্রেশন আর আমরা যে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি তা হচ্ছে "মিডিয়েশন" এ মিডিয়েশন পদ্ধতি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সালিসী।

আমরা প্রায়ই দেখি গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বল শহরে কোথাও যেখানে সমাজিক বন্ধন এবং সমাজগত প্রশাসন দৃঢ় সেখানে সাধারণতঃ পারিবারিক বিষয়, চুরি, জমিজমা সংক্রান্ত

www.pathagar.com

বিরোধ থেকে শুরু করে ধর্ষণ কিংবা হত্যার মত ঘটনাও সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নতর পর্যায় থেকে শুরু করে আরবিট্রেশন পদ্ধতির সালিসীর বিভিন্ন পর্যায়ের সালিস ব্যবস্থায় বসে ক্ষমতাধারী ও অর্থশালী ব্যক্তিরা এ সব বিরোধের সমাধান দিচ্ছে এবং অর্থদন্ড কিংবা জুতাপেটা থেকে শুরু করে সমাজচ্যুত বা গ্রাম ছাড়া করা পর্যন্ত শাস্তি দিচ্ছে। এবং এ শাস্তি যদি কেউ অমান্য করে তাহলে তার জন্য রয়েছে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়ার মত আরও ভয়ানক শাস্তি। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। সিলেট শহর থেকে ২ কি: মি: দূরের এক গ্রামে কোন এক নৈতিকতা সংক্রান্ত ঘটনায় গ্রামীণ এক বয়স্ক ব্যক্তি বাধা দিতে গেলে তিনি একদল গুন্ডার হাতে নিগৃহীত হন। এ ঘটনা গ্রাম্য সালিসে উপস্থাপন করা হয় এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে জুতাপেটা ও অর্থদন্ড দেয়া হয়। কিন্তু অভিযুক্ত অপরাধীরা এ শাস্তি প্রত্যাখ্যান করলে উর্ধ্বতন সালিসে তা' প্রেরণ করা হয়। সেখানেও অভিযুক্তরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে স্থানীয় সর্বোচ্চ সালিস ব্যবস্থা যাকে স্থানীয় ভাষায় "সুপ্রিম কোর্ট'' বলা হয় সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে অভিযুক্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হবে। এ পর্যায়ে অপরাধীরা ভীত হয়ে সুপ্রীম কোর্টের সালিসী রায়ের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে এবং প্রথম দেয়া শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করে। দ্বিতীয় উদাহরণ ভারতের গুজরাট রাজ্যের রংপুর নামের এক আদিবাসী এলাকায়, সেখানকার নাম করা একজন সমাজকর্মী হরিবল্লভ ভাই পারেখ পরিচালিত আশ্রয় " আনন্দ নিকেতনে'' প্রত্যেক মাসে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য কিংবা প্রয়োজনে দুটি সালিসী বৈঠকের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে আরবিট্রেশন ধরনের সালিস নয় বরং মিডিয়েশন ধরণের সালিস ব্যবস্থার মাধ্যমেই তাদের বিরোধগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়।

মধ্যস্থতা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালত (কোর্ট) এর পরিপূরক। জানা গেছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৮০ ভাগ বিরোধ বিবাদই এ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন। বিবাদমান উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি সুষ্ঠ সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তিনি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। সালিসী ব্যবস্থাও প্রায় একই পর্যায়ের তবে সালিসী ব্যবস্থায় বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে আগেই একটা ঐকমত্যে পৌছতে হয় যে বাদী বিবাদী উভয়ই সালিসকর্তার মাধ্যমে কাজ করে যাবেন। এ ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের দেশেও আছে। তবে অনেক সময় তা ' অপরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত হয়।

সালিসী ব্যবস্থা কেন প্রয়োজন

সালিসী ব্যবস্থা হচ্ছে কলহ বিবাদ মেটাবার একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতেও একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি বা সালিশ দল বিবাদরত দলকে মীমাংসায় পৌছতে সাহায্য করেন। নিষ্পত্তিকারী ব্যক্তি কোন বিচারক নন অথবা ত্রুটি অন্বেষণকারী নন। তিনি মীমাংসার পদ্ধতিতে সাহায্য করতে মতামত পেশ করতে পারেন। সালিসী ব্যবস্থায় সালিসী ব্যক্তি কোন আইন প্রয়োগ করেন না অথবা কোন মনস্তাত্বিক থেরাপী

www.pathagar.com

ব্যবহার করেন না। তিনি বিবাদরত দলকে মীমাংসায় পৌঁছাতে শুধু আইনের ব্যাখ্যা অথবা মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।

সালিসী ব্যবস্থায় গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। সালিসী ব্যক্তি বা দল সর্বদা বিবাদের বস্তুনিষ্ঠ এবং আবেগ প্রবণ দিকের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেন। বিবাদরত দলকে বিবাদের আইন সম্পর্কিত তথ্য এবং আর্থিক ক্ষতির বিষয় অবহিত করা হয়। এবং মীমাংসার শর্তসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে সালিসী ব্যবস্থায় যে কোন কলহ-বিবাদ মীমাংসা করা যায়। তবে সত্যিকারের সফলতা তখনই আশা করা যায়, যখন বিবাদরত দল তাদের নিজেদের স্বার্থে অথবা মামলার ঝামেলা এড়াতে বা বন্ধুসুলভ ব্যবহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। মামলায় হার-জিৎ থাকে কিন্তু সালিসী ব্যবস্থায় বিবাদরত পক্ষকে কোন কিছু হারাতে হয় না। এখানে মিলনের সেতুবন্ধন গড়ে উঠে। কোর্টের মামলা বিচার ব্যায়বহুল এবং দীর্ঘসময়সাপেক্ষ। দেখা যায়, কোর্টের রায়ে এক পক্ষ বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত হয় এবং তারা কোর্টের প্রতি আস্থাশীল হয়েও ভবিষ্যতে আরও মামলা-মোকদ্দমায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে, অপর পক্ষ পরাজয় বরণ করে সর্বসান্ত হয়ে কোর্টের প্রতি চিরদিনের জন্য ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা পোষণ করে। তাছাড়া কোর্টে অপরিচিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এবং অপরিচিত পরিবেশে বিবাদরত দল বা ব্যক্তি নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সাক্ষীগন তাদের সাক্ষের গোছগাছ করে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। অনেক সময় অন্যের চাপে ও ভয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে সালিশী ব্যবস্থায় বিবাদরত দলের তেমন কোন খরচ হয় না এবং বিবাদের সমাধান খুব দ্রুত পাওয়া যায়।

সালিসী ব্যবস্থা যেহেতু বিবাদরত দলের সম্মতিতে হৃদ্যতাপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকলে খোলামেলা এবং স্বাধীনভাবে তাদের বক্তব্য পেশের অবারিত সুযোগ পায়। কোন প্রকার সংকোচ বা ভয় ভীতি এখানে কাজ করে না। বিবাদরত দল বিবেকের তাড়নায়, মনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবাদ মীমাংসার জন্য তাদের স্ব স্ব প্রয়োজনীয়তা এবং শর্তাবলী পেশ করে এবং সালিসী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিবাদের সুষ্ঠ সমাধান চায়।

সালিশের সূত্রপাত ও সালিসে আলোচ্য ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে বিরোধ বাধার পরই সালিসের সূত্রপাত হয়। এ বিরোধ নানা কারণে হতে পারে। যেমন: পরিবারিক বিষয়, চুরি, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ থেকে শুরু করে ধর্ষণ কিংবা হত্যার মত ঘটনা সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করা হচ্ছে। সালিস আদালতের নিয়ম মোতাবেক সালিস আদালত ধর্ষণ বা হত্যা, নাবালকের সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে সাধারনতঃ সালিসী করা যায় না। কিন্তু দেশের বাস্তব পরিস্থিতির কারণে

www.pathagar.com

অনেক সময় উপরোক্ত বিষয়েও সালিস করা হচ্ছে। অনেক সময় আদালতের দীর্ঘসূত্রীতা, প্রচুর অর্থ ব্যয়, ন্যায় বিচার না পাওয়া ইত্যাদি কারণে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সালিসীতে মীমাংসা করা হয়।

এ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, দেওয়ানী বা সিভিল ধরণের বিরোধ ছাড়াও নীতিগতভাবে অসংগত এবং অনুচিত মনে হলেও সালিস ব্যবস্থায় তা যেই পদ্ধতির সালিস হোক না কেন, সেখানে ফৌজদারী বিষয় সংক্রান্ত বিরোধও নিষ্পত্তি হচ্ছে। এটা অনুচিত জেনেও বাস্তবতার খাতিরে পুলিশের অনেক সময় দুর্নীতি, আস্থাপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার অভাব, মামলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতা, আদালতে বৈধ ও অবৈধভাবে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগ ইত্যাদির কারণে মানুষ সালিসী ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধানে বেশী আগ্রহী হয়।

সালিসী ব্যবস্থায় করণীয় :

সমস্যা সৃষ্টির ফলে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা, অবিশ্বাস, অপর্যাপ্ত যোগসূত্র, আবেগ প্রবণতা বেড়ে যায়। দুই পক্ষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা এবং শান্তি বিঘ্নিত হয়। যে ব্যবস্থায় এ সকল অবস্থার বিপরীতে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যোগযোগ, বিশ্বাস, শান্তি, মিলন, নিরাপত্তা, শান্তি বা ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন অবস্থার সৃষ্টিই হল সালিস।

সালিসী অবস্থার উপকারিতা / অবদান :

সমস্যায় পতিত হয়ে মানুষ আইনের সহায়তা নেয়। কিন্তু নানা জটিলতায় মানুষ অনেক সময় ন্যায় বিচার মামলা মোকদ্দমা করেও পায় না। তাছাড়া আদালত দেখে আসামী সত্যিই অপরাধ করেছে কিনা। কিন্তু সালিস ব্যবস্থায় দেখা হয় কোন পরিস্থিতিতে কি কারণে অপরাধ করেছে তার বাস্তব পরিস্থিতি। এর উপর ভিত্তি করে প্রকৃত সমস্যার মূল উৎপাটন করে সালিসী ব্যবস্থায় সমাজে শান্তি স্থাপন করা হয়। এর ফলে :

- সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়।
- মানবিক প্রয়োজনের গুরুত্ব দেয়।
- গঠনমূলক প্রতিকার/ সমাধান দেয়।
- অতীত নয় ভবিষ্যত ভাবে।
- সমাজিক শান্তি স্থাপিত হয়।
- অর্থ ব্যয় হয় না এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিবাদে সুষ্ঠু সমাধান হয়।

সালিসী ব্যবস্থা সফল হওয়ার উপায়সমূহ:

বিভিন্ন কারণে সালিসী ব্যবস্থা ফলপ্রসু হয় তবে যে সকল প্রধান কারণে সালিসী ব্যবস্থা সফল হয় তার মূল পদক্ষেপগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

- মূল সমস্যার উদঘাটন ও সহজ করে সমাধান করে।
- সালিসী সংঘাতমূলক নয় বরং সহযোগিতামূলক।
- এ ব্যবস্থা মানুষের মানবিক প্রয়োজন স্বীকার করে।
- গঠনগূলক প্রতিকার/ সমাধান করে।

www.pathagar.com

- মীমাংসায় পৌঁছুতে সুযোগ দেয়।
- অতীতের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের শান্তি অন্বেষণ করে।
- বিবাদরত দলকে সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলে।
- সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করে।
- চুক্তিতে পৌঁছুতে সহায়তা করে।
- কোন দলকে অপমান করে না বরং শ্রদ্ধা করে।
- শক্তি ও ক্ষমতার পার্থক্য না করে সমান চোখে সকলকে দেখা হয়।
- লুকায়িত সমস্যাও প্রকাশ করে।
- নীরব ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করায় এবং বাচাল ব্যক্তিকে শান্ত ও সংযত করে।
- দলসমূহের মনের পরিবর্তন করে।
- পরিপূর্ণ সত্য প্রকাশ করে।
- সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।
- ভবিষ্যতে কলহ এড়াতে সহায়ক হয়।
- উভয় দল যাতে লাভবান হতে পারে সে চেষ্টা করে।
- বিষয়ের স্বার্থের উপর জোর দেয়। ব্যক্তি বা ঘটনার উপর জোর দেয় না।
-উপমা, উদাহরণ, স্থানীয় ভাষা, বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করে।
- চেনা পরিচিত খোলামেলা পরিবেশে সালিসী হয়।
- আবগে ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ পায়।
- রাগ নয়, উপদেশ দেয়া হয়।
- উভয় দলকে মীমাংসার রাজী করানো।
- উভয় দলের সম্মান রক্ষা করা।
- বল প্রয়োগ ও বাইরের চাপে নয় বরং স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে সমস্যার সমাধান করে।

সালিশের প্রকারভেদ

সালিশ প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তবে নিম্ন বণিত চার প্রকার প্রক্রিয়ায় সালিস হয়ে থাকে।

মধ্যস্থতা (Mediation) : মধ্যস্থতাকারী সেতুর মত কাজ করবে, তবে নিজে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।

তৃতীয় পক্ষ (Concilliation) : এ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষকে একত্রিত করে কিন্তু কোন ভূমিকা রাখবে না। এতে দুটি পক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে।

সমঝোতা **(Negotiation):** বিবাদরত পক্ষসমূহ নিজেদের উদ্যোগে সমঝোতায় আসতে এ প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করে। এখানে তৃতীয় পক্ষ থাকবে না।

এক পক্ষের সিদ্ধান্ত **(Arbitration):** একজন নিয়োগ করবে। দুই পক্ষ সমঝোতায় আসবে এবং সালিস করবে। এখানে নিয়োগকৃত ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত দেন দুটি পক্ষই তা মেনে নিতে বাধ্য থাকেন। এখানে সাক্ষীদের মতামত শুনে রায় দেন।#

www.pathagar.com

পল ডি, কস্তা
আইনজীবী, লেখক ও উন্নয়ন কর্মী

রূপান্তর-এর গণতন্ত্র ও সুশাসন বিষয়ক কয়েকটি প্রকাশনা:

১. একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন-কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব
২. স্থানীয় সরকার : ধারণা ও কর্মকান্ড
৩. ইউনিয়ন পরিষদ ও জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক দায়িত্ব
৪. স্থানীয় সরকারে গণতন্ত্র : নাগরিক সমাজের ভূমিকা
৫. স্থানীয় সরকার এবং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ
৬. ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কাজ
৭. প্রশ্নোত্তরে ইউনিয়ন পরিষদ
৮. ইউনিয়ন পরিষদের কিছু কথা
৯. ইউনিয়ন পরিষদ কেমন
১০. দৈনন্দিন আইন
১১. ভোটার হিসাবে যা করবেন যা করতে পারেন
১২. নারীর রাজনীতি এবং স্থানীয় সরকার
১৩. মহানগরীর নাগরিক অধিকার

ISBN 984-629-006-3

পুস্তিকাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা-ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে রূপান্তর কর্তৃক প্রকাশিত।
প্রচ্ছদের ছবি : রফিকুল ইসলাম খোকন। প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০৪
Improving Local Level Governance
USAID Initiative Implemented By RUPANTAR